International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 66-71
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

পত্রালাপে রবীন্দ্রনাথ ও আশালতা সিংহ

শ্যামল কুমার মণ্ডল
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

Abstract :

Ashalata Singha is a noteworthy name in the history of Bengali literature. But there is little study exploration about this Authoress in Bengali literature or study on this great woman is hardly noticed in the history of Bengali literature. Some enthusiastic Researchers have written on this Authoress. There was a very amiable relationship between Rabindranath Tagore and Ashalata Devi. We come to know about that deep sign deep bonding from some letters written by Rabindranath Tagore. She was an object of great affection to Rabindranath. Besides being a novelist, she was an essayist and playwright. Throughout her life she committed herself in practicing literature. She had written in many journals and papers with dignity for many years. Many of her essays and novels fascinated not only Rabindranath but also many great persons of her contemporary time. In this connection there was a regular exchange of letters between Ashalata Devi and her contemporary sagacious of letters. Many unknown aspects of such an outstanding authoress are broadcasted in her correspondence with Rabindranath through letters.

Keywords : *Letters, Literature, Relationship, Novelist, Dignity, Researchers.*

বিখ্যাত লেখিকা আশালতা দেবীর (১৯১১-১৯৮৩) নাম আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ ত্রিশের দশকে মাত্র ১৬ বছর বয়সে একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের তাবৎ মনীষীদের ও বোদ্ধাদের চমকে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম' রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'সমালোচনা করবো না' বলেও এক চিঠিতে উপন্যাসটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। যেকোনো সাহিত্যিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসাপত্র নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা পায়। আবার সেই লেখিকা বা সাহিত্যিক যদি সাহিত্যাঙ্গনে নবাগত নবাগতা হন। আর সেজন্যই বোধহয় এতদিন পর মুষ্টিমেয় কিছু পাঠক আশালতা সিংহ নামটি বিস্মৃত হতে পারেননি। তবে শুধু উপন্যাস নয় আশালতা দেবীর 'নারী' শিরোনামে নিবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল। যার ফলে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ একটি পত্র লিখে নিজস্ব মতামত জানিয়েছিলেন। আশালতা দেবীর 'চিন্তা স্বচ্ছ ও ভাষা অনাবিল' -এ কথা কবি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন এবং তাঁর লেখায় 'আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের শান্তি' নিয়েই যে লেখিকার অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েছে সেকথাও জানিয়েছেন।

আশালতা দেবীর জন্ম হয় ভাগলপুরে এক আইনজীবী পরিবারে। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার, মাতা যোগমায়া দেবী। ছোট থেকেই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় বীরভূমের বাতিকার গ্রামে জমিদার পরিবারে - স্বামী ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ (পরবর্তীকালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ পুরী)-র সাথে।

পরবর্তীকালে আশালতা দেবীও সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'আশাপুরী' নামে পরিচিতা হন। বহু মানুষের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁর পত্রালাপ হয়েছে প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর সাথে। তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা দেশ ইত্যাদি পত্রিকার লেখিকা ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'লীলা-পুরস্কার' লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ আশালতা দেবীকে যে পত্রগুলি লিখেছিলেন তার চারখানি মূলপত্র ও দু'খানি পত্রের প্রতিলিপি আছে রবীন্দ্র-ভবনে। সেই সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশালতা দেবীর একখানি পত্র। আমরা এই পত্রালাপের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ ও আশালতা দেবীর সুসম্পর্কের পরিচয় জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত এই পত্রগুলি প্রথমে 'রবীন্দ্র-বীক্ষা'[১] নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেহেতু এই পত্রগুলি অনেক পাঠকের দৃষ্টিগোচরে আসেনি তাই দেশ পত্রিকা এই চিঠিগুলি পুনরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। এই চিঠি গুলির বানান দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রানুযায়ী রক্ষিত হয়েছে।

পত্র : ১

প্রথম পত্রটি[২] 'নারীর মনুষ্যত্ব' শিরোনামে মাসিক বিচিত্রা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। কবি এই চিঠিটি লিখেছেন কলকাতা থেকে ১৫ বৈশাখ ১৩৩৫ সালে। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, - ' "নারী" বলে তোমার প্রবন্ধটি আমার হাতে পড়েচে। এই বিষয়ে অনেক বাঙালী মেয়ে আজকাল লিখতে বসেচেন। সে সব লেখায় মুদ্রাদোষ অত্যন্ত বেশি। তাঁদের লেখা অশান্ত, তাতে উদ্দীপনা কম উত্তেজনা বেশি। আলোকের চেয়ে দাহ বেড়ে উঠেচে। তোমার লেখায় আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের শান্তি, এতে কলহের ঝাঁজ পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা থেকে একথা স্পষ্ট যে সেইসময়ে যে কয়েকজন লেখিকারা সাহিত্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আশালতা সিংহই ছিলেন অগ্রগণ্যা। 'নারী' প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে তার প্রমাণ এই দীর্ঘ চিঠি। প্রসঙ্গক্রমে এই চিঠিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। অকপটভাবে ভালো-মন্দের বিচার করেছেন – " স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ভেদ সম্বন্ধে বোধটা প্রকৃতি আপন প্রয়োজনের সীমায় পরিমিত করে দিয়েচে। মানুষ আপন কল্পনা ও সংস্কারের দ্বারা তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তুলচে। প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যে আয়োজন তাতে অমিতব্যয়িতা নেই। মানুষ তার পরিবেষণের মাত্রাটাকে অত্যন্ত বাড়াবার জন্যে ক্ষুধাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রাখচে। ভেদ-বোধের মধ্যে সেই ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাটাকে চির অতৃপ্ত করবার জন্যে বিস্তর কৌশল।" কবির কথায়- " কিন্তু এই বৃহৎ যজ্ঞক্ষেত্রে মেয়েকে আপন স্থান নিতে হলে অশিক্ষিত পটুত্বে চলবে না। জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হলে শুধু ইন্‌স্টিংক্টের জোরেই চলে, কিন্তু বড় ক্ষেত্রে দেহ মন হৃদয়ের পরিপূর্ণ শিক্ষা চাই। বর্বরতার ক্ষুদ্র সীমায় ইন্‌স্টিংক্টের স্থান আছে, সভ্যতার বড়ো সীমায় সে দুর্বল"। আবার সমাজের মেয়েদের অবস্থান স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন এই চিঠিতে – " মেয়েদের উপরে প্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত মা হবার তাগিদ আছে। তেমনি সমাজের দিক থেকে পুরুষের ওপর তাগিদ আছে অত্যন্ত কেজো হবার। যদি পুরুষ কেজো হতে না পারে তাহলে তার শাস্তি ও লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না..."। মেয়েদের মানবত্ব প্রসঙ্গেও উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখিকাকে জানিয়েছেন – " পূর্ব যুগে মেয়েরা ছিল পুরুষদের আওতায়। সংসারের সংকীর্ণ প্রয়োজনের চাপে তারা পারিবারিক কল-টেপা পুতুলের মত বিহিত নিয়মে আওয়াজ করেচে, হাত-পা নেড়েচে। অজ্ঞতা ও অশক্তিই যে তাদের ভূষণ এই কথাই তারা জানে। মাতা বা গৃহিনীর বিশেষ মোড়কে তাদের পরিচয় - তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্য মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো বা অস্বীকৃত, কখনো বা নিন্দিত। এমনি ভাবে মেয়েরা মানুষের একটি অংশমাত্র হয়েছিল। সমাজে অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি মানুষের পূর্ণতা খর্ব হয়ে একটা প্রকাণ্ড লোকসান ঘটিয়ে এসেচে। আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করচে। জননার্থং মহাভাগাঃ বলে তাদের গণনা করা হবে না সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য। মানব সমাজে এই আত্মশ্রদ্ধার বিস্তারের মতো এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না। গণনায় মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।..." এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাকে পত্রালাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন আশালতা দেবীর কাছে।

পত্র : ২

২৬ মাঘ ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতন থেকে আশালতা দেবীকে প্রেরিত দ্বিতীয় চিঠিতে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ আশালতা দেবীকে নারী-পুরুষের সম্পর্ক খুব সংক্ষেপে যথাযথভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম পত্রের উত্তরস্বরূপ আশালতা দেবী একখানি পত্র কবিকে পাঠান এবং তারই প্রত্যুত্তরে কবির এই দ্বিতীয় চিঠির অবতারণা। এছাড়া কবির সঙ্গে আশালতা দেবীর তর্ক-বিতর্কের কথাও এই চিঠিতে উঠে এসেছে – " আমার শরীর অসুস্থ। তোমার চিঠিতে তুমি যে তর্ক তুলেচ ভালো করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এখন আমার পক্ষে অসাধ্য..."। অন্যদিকে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন – " স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধকে সত্য করলে তবেই সেই মিলনে সুখ হয় - কিন্তু সত্য করার মানেই নিয়মবন্ধনকে স্বীকার করা। এস্থলে দুরূহ তর্কের বিষয়টা এই যে সম্বন্ধটা কোনো কারণে যদি সত্য না হয়, যদি তার মধ্যে অন্যায় থাকে তবে সেটাকে মানার দ্বারা অকল্যাণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা?..."। কবির এই উক্তি থেকেই বুঝতে পারি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যখন কল্যাণকর ভূমিকা নেয়, তখনই স্বাধীনতা পায় শরীর, মন। আর যদি তা না হয় তাহলে সেই সম্পর্ক আত্মহত্যার সামিল।আলোচনার সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত এই চিঠিটি উদ্ধার করতে পারি –

কল্যাণীয়াসু,
শান্তিনিকেতন

আমার শরীর অসুস্থ। তোমার চিঠিতে তুমি যে তর্ক তুলেচ ভালো করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এখন আমার পক্ষে অসাধ্য।

মানুষের পক্ষে ঐকান্তিক স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। এমনকি আধ্যাত্মিক মুক্তি যাদের লক্ষ্য তাদেরও সংযমের প্রয়োজন - স্বৈরিতা মুক্তির অন্তরায়। চিত্তবৃত্তিকে স্বাধীন করতে যদি চাই তবে বুদ্ধির পথে চলতে হবে- সে পথ মানসিক উচ্ছৃংখলতার উল্টো পথ। অর্থাৎ তাতেও নিয়ম মানতে হবে নইলে পাগলামিতে পৌঁছব। শরীরের স্বাস্থ্য শরীরের যথার্থ স্বাধীনতা, কিন্তু সে স্বাধীনতা শারীরিক যথেচ্ছাচার নয়। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধকে সত্য করলে তবেই সেই মিলনে সুখ হয় কল্যাণ হয়- কিন্তু সত্য করার মানেই নিয়ম বন্ধনকে স্বীকার করা। এস্থলে দুরূহ তর্কের বিষয়টা এই যে সম্বন্ধটা কোনো কারণে যদি সত্য না হয়, যদি তার মধ্যে অন্যায় থাকে, অধর্ম থাকে, অত্যাচার থাকে তবে সেটাকে মানার দ্বারা অকল্যাণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কি না ? যে সম্বন্ধের মধ্যে মানুষের আত্মাবমাননা, সে সম্বন্ধেকে স্বীকার করা আত্মহত্যারই অঙ্গ –এই ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার কতদূর তাই নিয়েই স্বাধীনতার তর্ক কঠিন হয়ে ওঠে। যে স্থলে সমাজশাসন ও ন্যায়ধর্মের প্রেরণা পরস্পরবিরোধী সেই ক্ষেত্রেই লোকব্যবহার সম্বন্ধে বিচার এসে পড়ে।

ইতি
২৬ মাঘ ১৩৩৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩

তৃতীয় পত্রটি[৩] কবি ১ মে ১৯৩৪ সালে জোড়াসাঁকো থেকে লিখেছেন। এই পত্রটিতে আশালতা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম' সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রেই তিনি 'সমালোচনা করবো না' বলেও এই উপন্যাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা উজাড় করে দিয়েছেন। আশালতা দেবীর প্রথম উপন্যাস যে কবি-মনে দাগ কেটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে কবি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল – অমিতা, অমিয়, বীণা, ভবানীবাবু প্রমুখ। এই চিঠির গুরুত্ব এখানেই যে নারীর চোখে পুরুষ এবং পুরুষের চোখে নারীর যে রূপ বা গুণ লেখিকা দেখিয়েছেন তা কতটা যুক্তিযুক্ত বা বাস্তব সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই চিঠিটি কবির কথায় লেখিকার সাথে 'বোঝাপড়া'। উপন্যাসের শিরোনাম দেখেই কবির মনে হয়েছে এখানে অমিতারই ছবি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যভাবে বললে মেয়েদের বুদ্ধি, ত্যাগ ও আদর্শকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কবির বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু কখনোই পুরুষকে

অবজ্ঞার চোখে দেখিয়ে মেয়েদের ত্যাগ ও আদর্শকে বড়ো করে দেখালে মেয়ে চরিত্র পূর্ণতা পায় না। হয়ে ওঠে না সে মহৎ। এই উপন্যাসে অমিতার যেমন অনেক গুণ আছে, তেমনি অনেক দোষও আছে। সেই দোষগুলোকে আড়াল করে লেখিকা যদি গুণ ও আদর্শকেই জোরালোভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করেন তাহলে সেই চরিত্র সার্থকতা পায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – " কোনো পুরুষ যদি এই গল্প লিখত তাহলে আমি চোখ বুজে বলতুম সে স্ত্রী-চরিত্র জানে না। ..." এ প্রসঙ্গে অমিয় ও অমিতার বিচ্ছেদের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন – " বীণার কটাক্ষপাতে তাদের মধ্যে যখন বিচ্ছেদ ঘটেচে তখন অমিয় তার বাবাকে যে সব চিঠি লিখেছিল সেই চিঠি অমিতা লুকিয়ে পড়েছিল। মনে করেছিল নিশ্চয়ই সুন্দর সুন্দর চিঠিই লিখেচে। কিন্তু পড়তে গিয়ে যখন দেখলে সমস্ত চিঠিতেই বারে বারে অমিতের জন্য সে উদ্বেগ প্রকাশ করেচে, তখন চিঠির এই সৌন্দর্যহানিতে তার ধিক্কার জন্মালো। এটা সম্ভব কিনা তা বিচার করব কি করে? নিজেকে অমিতা বলে কল্পনা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।..."এখানেই কবি আপত্তি তুলেছেন এবং তিনি নিজে বলেছেন – " আমি যদি অমিতা হতুম তাহলে ঐটেতেই আমাকে প্রবল আনন্দ দিত। যে কোনো ভদ্র পুরুষ তার সম্বন্ধে অকৃত্রিম উৎকণ্ঠাবোধ করচে এটা কোনো মেয়ের পক্ষেই বিতৃষ্ণাজনক হতে পারে বলে তো মনে হয় না।..." অমিতা 'যথোচিত স্বাভাবিক' কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র 'বীণার ভ্রু-ভঙ্গিতে' অমিয়র সাথে বিচ্ছেদের ব্যাপারটিকে কবি মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া এই উপন্যাসে অমিয় ও অমিতার প্রেমকেও সুনজরে দেখান নি লেখিকা, সেকথাও প্রসঙ্গক্রমে এই চিঠিতে জানিয়েছেন- "পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েচে আমি হয়তো জানিনে। আমি হয়তো যেখানে যুক্তিসঙ্গতি সুবিচার খুঁজচি সেটা পুরুষবুদ্ধি থেকে। মেয়েদের ভালবাসার বায়ুবিজ্ঞানে ঝড় এবং গুমট, সাইক্লোনিক এবং অ্যান্টিসাইক্লোনিক মেজাজ শীততাপের যে বৈষম্য অকস্মাৎ ঘটে সেটার গূঢ় রহস্য আমাদের হয়তো জানা নেই। কিন্তু হৃদয়াবেগপ্রধান চরিত্রেও বুদ্ধিবিচারের একান্ত বিলোপ নেই। যদি থাকে তবে তার মনোহারিতা চলে যায়। আমি যদি অমিয় হতুম তাহলে আমার স্বভাবের পারুষ্য কঠিন বেগে জেগে উঠত –কেননা ভালবাসার দানপ্রতিদানে এরকম লঘুত্বের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই প্রচন্ডতায়- যেমন লঘু বাতাসে টান দিয়ে নিয়ে আসে ঝড়কে। বোধ করি অমিতা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই দুর্দান্তকেই চেয়েছিল পায়নি বলেই উদ্দীপনার অভাবে অতদিন তার প্রেম অমনতরো অসুস্থ হয়েছিল। এরকম অবস্থায় ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে আদরের চেয়ে আঘাতই বেশি কাজ করে – রূঢ় আঘাত - এখানেই যথার্থ পুরুষের দরকার। প্রথম থেকেই সেই অসহিষ্ণুতাকে সেই কঠোর পুরুষকে যদি আনতে তবে খুসি হতুম। অমিয়ের প্রতি অবিচার করবার যেমন বড়ো রকম কারণ হয়নি, তার প্রতি অনুকূল হবারও তেমন দুর্বার রকমের কারণ ছিল না।" সবশেষে কবি লেখিকার কাছে প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন – " তোমারই কাছে জান্‌তে চাই গল্পের মাঝখানে অমিতার মধ্যে যে আলোড়ন, এত ক্ষীণ প্রশাখার উপরেই কি তার দোলা সয় ! পুরুষেরা বলে থাকে মেয়েরা দুর্জ্ঞেয় কিন্তু এত দুর্জ্ঞেয় কি তোমার কাছেও ? তাদের কৃত অতিবড় দুর্ঘটনার জবাবদিহি কি এত অকিঞ্চিৎকর ?" তাই এই চিঠি হয়ে উঠেছে আশালতা দেবীর প্রথম উপন্যাসের যথার্থ গঠনমূলক সমালোচনা।

পত্র : ৪

আশালতা সিংহকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ পত্র টি ১৭ অগষ্ট ১৯৩৪ সালে উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম থেকে লিখেছেন। এই চিঠিতে লেখিকা 'অভিমান' গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করার অনুনয় জানান। তারই প্রত্যুত্তরে কবি এই চিঠিখানি লেখেন। এই ছোট্ট চিঠিতে কবি জানান – " তোমার বইখানি পড়ব। অভিমত দেওয়া নিয়ে আজকাল অত্যন্ত সংকোচ বোধ করি। সমালোচকের দায়িত্ব আমার নয়, অথচ গায়ে পড়ে মোড়লি করতে গিয়ে এত অশান্তি সৃষ্টি করেছি যে এ কাজে আমার রুচি নেই। ..." আলোচনা বা সমালোচনা যাই হোক না কেন কবি যেকোন মন্তব্য থেকে অব্যাহতি চাইছেন তা স্পষ্ট। তবে এই চিঠিতে তিনি বিনয়ের সাথে বলতে ভোলেন নি লেখিকার প্রতি তাঁর স্নেহের, শ্রদ্ধার ভাব এবং লেখিকার লেখার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা। এই চিঠিটি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি –

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BIRBHUM

কল্যাণীয়াসু,

তোমার বইখানি পড়ব। অভিমত দেওয়া নিয়ে আজকাল অত্যন্ত সংকোচ বোধ করি। সমালোচকের দায়িত্ব আমার নয়, অথচ গায়ে পড়ে মোড়লি করতে গিয়ে এত অশান্তি সৃষ্টি করেছি যে একাজে আমার রুচি নেই। আমার এ বয়সে বাতাসে অশান্তি ঘুলিয়ে তুললে তাতে আমার অনর্থক ক্ষতি হয়। তোমাকে স্নেহ করি শ্রদ্ধা করি যদি মোকাবিলায় আলোচনা করে কাজ সারতে পারতুম তাতে কুণ্ঠিত হতুম না। আমার বয়সে মানুষ কথা কয় বেশি অন্য লোকেরাও তা সহ্য করে- কিন্তু লেখার মধ্যে স্বভাবতই যে স্পর্ধা প্রকাশ পায় সেটা সহ্য করতে অনেক সহিষ্ণুতার দরকার হয়। যে কালকে আমরা অগত্যা আশ্রয় করেছিলুম সে কাল থেকে এখনকার কালের যবনিকা অনেক দূরে সরে গেছে এইজন্যে কথায় কথায় আমাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটবার কথা। সেজন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে মানুষ অসময়ে অকারণে অনধিকারপ্রবেশ করতে নিরস্ত না হয় তাকে অন্তত নির্বোধ বলতেই হবে। - তোমার লেখা আমার ভালো লাগবার সম্ভাবনা আছে, আর কিছু না হোক তার একটা কারণ তোমার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে -কিন্তু ভালোমন্দ কোনো কথা পাড়তে গেলেই এখনকার হাওয়ায় বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। যেহেতু এরকম হাওয়া আলোড়ন করাটা আমার এ বয়সে অস্বাস্থ্যকর এবং আমার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য নয়, সেইজন্যে পঞ্চাশোর্ধে না হোক সত্তর বছরের পরে মৌনব্রতই শ্রেয়। ইতি ১৭ অগষ্ট ১৯৩৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৫

পঞ্চম পত্রটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন ২৬/৮/৩৭ -এ আশালতা দেবীর একখানি পত্রের অনুষঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশালতা দেবীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কবির পল্লীসংস্কার কবির প্রতি লেখিকার শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বহু কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্র বন্দনা করেছেন, কিন্তু তাঁর পল্লীচিন্তার প্রতি এইরকম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। শুধু কবি-রূপে নয় - কর্মী রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন আশালতা দেবীর কাছে 'পরমপূজনীয়'। আশালতা দেবীর চিঠির উত্তরস্বরূপ স্বল্প কলেবরে অল্প কথায় এই পঞ্চম পত্রটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রটি তুলে ধরা হল -

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হলুম। পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে আমার প্রয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছ- আমার দেশে এটা দুষ্প্রাপ্য বলেই খুশিও হয়েছি বিস্মিতও হয়েছি। নিন্দাপ্রিয়তার রোগবীজে বাংলাদেশের হাওয়া বিষাক্ত -এ নিয়ে অল্প বয়সে দুঃখ বোধ করেছি, এখন দুঃখ পেতে লজ্জা বোধ হয় -অনেকটা মুক্তি পেয়েছি। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি থেকে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বই ধার দেওয়া হয়েছে জানি কিন্তু সাধারণ্যে বই দেবার নিয়ম আছে কি [না] এখানকার লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে।

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি ২৬/৮/৩৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৬

ষষ্ঠ পত্রটি কবি লিখেছেন পুরীর সার্কিট হাউস থেকে ৬/৪/৩৯ তারিখে। তবে তারিখটি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে একটু খটকা আছে, কেননা পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে - " ৬/৪/৩৯ তারিখটি ভুল। সম্ভবত ৬/৫ কিংবা ২৬/৪ হবে। কেননা রবীন্দ্রনাথ পুরী যান ১৯ এপ্রিল, তাই ৬/৪ সেখান থেকে চিঠি লেখা সম্ভব নয়। পুরীতে কবি তিন সপ্তাহের জন্য নবগঠিত ওড়িশার কংগ্রেস সরকারের অতিথি হন।"[৪] এই চিঠিতে বার্ধক্যজনিত কারণে লেখবার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন কবি। এই চিঠিটিও আমরা তুলে ধরলাম -

Circuit House
Puri

কল্যাণীয়াসু,
তোমার বইখানি পেয়েছি। পাকা হাতের লেখা। আমার পালে এখন হাওয়া বন্ধ –লেখনী চলে কিন্তু লগি ঠেলে, বায়ু অনুকূল হোলে কিছু লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ৬/৪/৩৯

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাদটীকা :

১. বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনের মুখপত্র।
২. এই চিঠিতে কবি প্রথমেই লিখছেন- " মন্টুকে যে চিঠি লিখেচ দেখেচি। " এখানে **মন্টু** হলেন কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭- ১৯৮০)।
৩. এই চিঠির এক জায়গায় কবি বলেছেন, - " কিছুদিন হোলো নন্দলাল তাঁর ছাত্র ও ছাত্রীদের বলেছিলেন,..." এখানে **নন্দলাল** বলতে তিনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (১৮৮২ - ১৯৬৬) –কে বুঝিয়েছেন, যিনি সেইসময়ে কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন।
৪. শারদীয় দেশ, ১৪০২। পৃ. ৫১

তথ্যঋণ :

আকর গ্রন্থ

১. ছিন্নপত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৫ অক্টোবর ২০০৫।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চক্রবর্তী, মধুরা - ' ছিন্নপত্রের তথ্যকোষ', ২০১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
২. সাহা, ডঃ গৌরচন্দ্র - রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী, প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ় ১৩৯১; ১৬ জুন ১৯৮৪। পরিবেশক - দে'জ পাবলিশিং।
৩. সাহা (রায়), জয়ন্তী - রবিন্দ্র-পত্রাবলী কালানুক্রমিক সংকলন, প্রথম খণ্ড (১৮৭৮ - ১৮৯০) , বইমেলা ২০১২, শ্রীভারতী প্রেস, কলকাতা।

পত্র-পত্রিকা:

১. শারদীয় দেশ, ১৪০২, পৃ. ৩১ - ৫১।